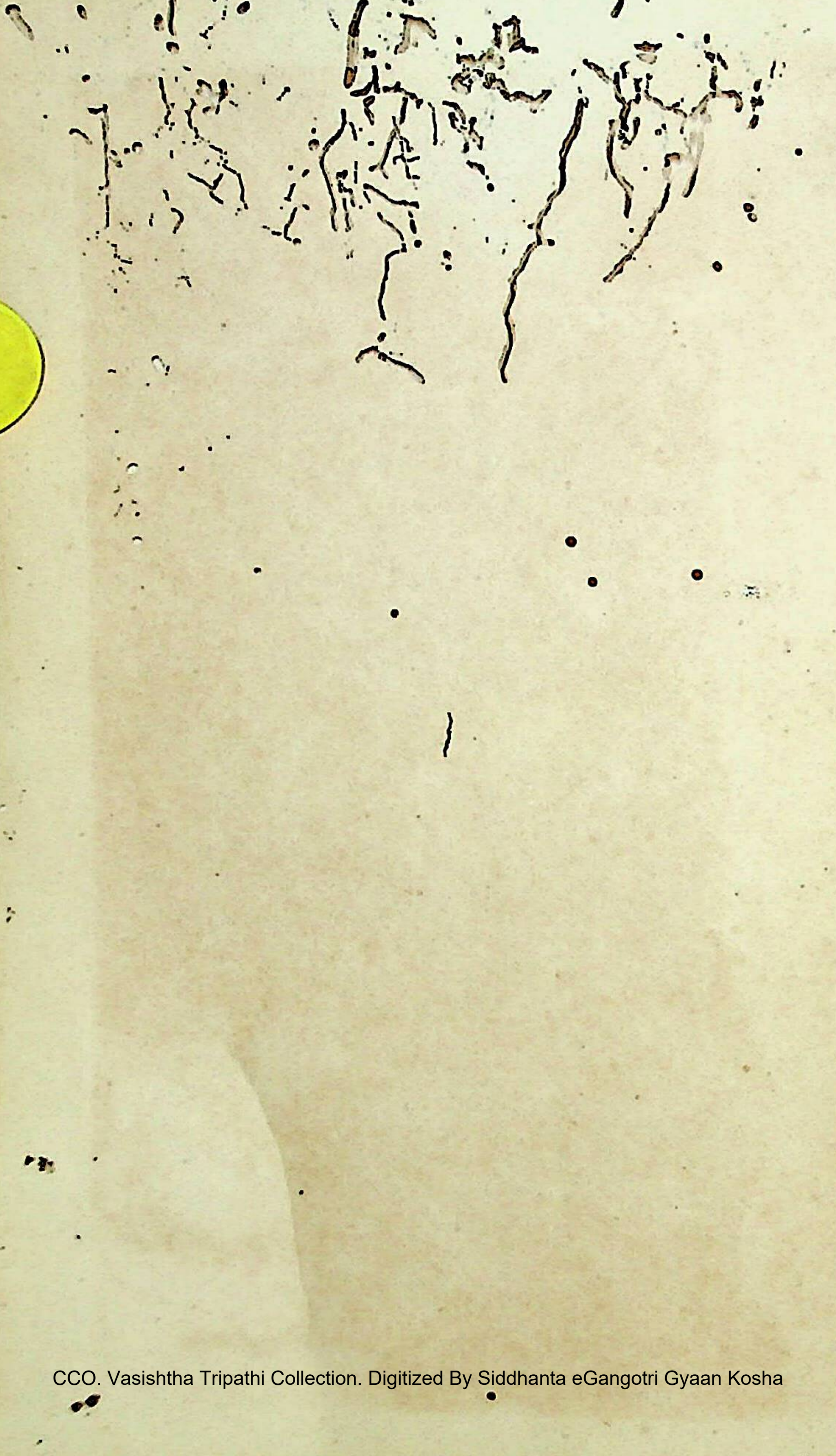
হে স্বদেশ আমার স্বদেশ

সম্পাদনা কমলেশ সেন





হে স্বদেশ অগ্নিময় স্বদেশ

সম্পাদনা
কমলেশ সেন

পরিবেশক
নিউ বুক সেণ্টার
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭[illegible]

বি. দত্ত
সাহিত্য প্রয়াস
রাজবাড়ী
কলকাতা-৫১

নিরঞ্জন দত্ত
মডার্ন প্রিন্টার্স (ইণ্ডিয়া)
১৬ ফরডাইস লেন
কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদচিত্র গৌতম বসু

দাম তিন টাকা

এই ক্ষণ এই কালের বিপ্লবী-মাননকে
অক্ষুণ্ণ রাখতে যারা টান টান করে
বুক পেতে দিল শত্রুর বেয়নটের সামনে
তাদেরি সকলের সাথে অমিয় তুষার দ্রোণকে



উনিশ শ বাষট্টি সালের গোড়ার দিকে আমরা কয়েকজন তরুণ একত্রিত হয়ে 'কর্ণিক' নামে একটি স্বল্প-পরিসর কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করি। কর্ণিক প্রকাশনের প্রথম দিকে আমাদের অনুভূতি ছিল, জ্বালা ছিল, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ছিল একান্ত অভাব। অবশ্য এই অভাবটা ছিল স্বাভাবিক। কারণ সেদিন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে কোন সৎ এবং নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মীর পক্ষেই এককভাবে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের এই বন্ধ্যাত্ব, এই স্তব্ধতা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছাধীন নয়। সমাজের আভ্যন্তরীন এবং বহিঃসংঘাত তাই একদিন এই জড়তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিল—এনে দিল প্রাণ-ঐশ্বর্য, এনে দিল তার প্রচণ্ড গতিবেগ। সেদিন পার্টির অসংখ্য কর্মী পার্টি নেতৃত্বের এই অসহনীয় শ্রেণী সমঝোতা নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের পথ খুঁজছিলেন। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথকে অনেকাংশে সহজতর এবং সাবলীল করে তুলল। পার্টির এই আপোসপন্থী বুর্জুয়া নেতৃত্ব সেদিন সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্রকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সত্তাকে শাসকশ্রেণীর হাতে তুলে দিয়েছিল।

নেতৃত্বের এই জঘন্য ভূমিকা সেদিন কোন সৎ কমিউনিস্ট কর্মীই মাথা পেতে গ্রহণ করেন নি, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছেন। এই পরিবেশ, এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েই কর্ণিক (পরবর্তী সময়ে কর্ণিক এবং নন্দন যৌথভাবে) তার কাব্য আন্দোলনের সমস্ত উপাদান এবং তার দৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তি পায়। তার পায়ের নীচে তৈরি হয় শক্ত মাটি। এই বিস্তীর্ণ শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়েই সেদিন আমাদের পত্রিকার সঙ্গে জড়িত কবিরা শুধু একজন কবি হিসেবেই নন, একজন বিপ্লবী কর্মী হিসেবেও ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্ভাবনাকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন তাঁদেরই একজন হয়ে ওঠেন।

এই কাব্য সংকলনের ভূমিকায় এই কথা কটি বলা আজ একান্তভাবে প্রয়োজন। কারণ এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দাঁড়িয়েই আমরা অতীতের বিপ্লবী সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিপ্লবী সাহিত্যের রূপরেখাকে ঐক্যবদ্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

আমাদের ফ্রণ্টের কবিদের অনেকেই ছিলেন শ্রমিক কৃষক এবং যুব-ছাত্র আন্দোলনের সর্বক্ষণের একনিষ্ঠ কর্মী। তাই তাঁদের কবিতার বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু, ব্যঞ্জনা এবং অভিব্যক্তির জন্যে মাথা কুটে মরতে হয়নি। কিম্বা বুর্জুয়া এবং তথা কথিত 'বিপ্লবী' কবিদের মতো বিশেষ আয়েশি পরিবেশেরও প্রয়োজন হয়নি। ব্যারিকেড লড়াই করতে করতে আমাদের কবিরা কবিতা লিখেছেন, মিছিলে যেতে যেতে কবিতার ভাষা মনে মনে আবৃত্তি করেছেন, বয়লারের গনগনে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে কিম্বা টেলিগ্রাফের থামে উঠে কাজ করতে করতে আমাদের শ্রমিক কবিরা কবিতার কথা ভেবেছেন। হাজার হাজার সশস্ত্র কৃষকের মিছিলের পুরো-ভাগে দাঁড়িয়ে তাঁরা আগুনের অক্ষরে সেই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

১৯৬২ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। অসহনীয় শোষণ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে অসংখ্য মানুষ নিজেদের সংগঠিত করে, ক্ষোভে জ্বালায় ফেটে পড়েছেন। কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, কখনো সংগঠিত ভাবে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। বিপ্লবী কর্মীরা সাধারণ মানুষের এই জ্বালা এই ক্ষোভের সঙ্গে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে যারা বিপ্লবী মুখোশ পড়ে আমাদের নেতৃত্বে এসেছিলেন তারা মানুষের এই জ্বালা, এই ক্রোধ, এই বিদ্রোহী মনোভাবকে তাদের নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থেই সংসদীয় পথের চোরাবালিতে ডুবিয়ে দিলেন। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় সমস্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করে দিলেন। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বিপ্লবী ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে তার ভিতকে আজ টলমল করে দিয়েছেন। যাঁরা মরণ-পণ-সংগ্রাম করে একদিন দুর্যোগের সময়ে পার্টির এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বুক দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তাঁদেরই বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। পুলিশের গুলিতে এবং গুপ্তঘাতকের হাতে আজ তাঁরা অনেকেই নিহত এবং অনেকেই জেলে বন্দী।

এই সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে দীর্ঘ দশ বছরেরও বেশি একটানা যে সংগ্রাম হয়েছে এবং যে সংগ্রাম আজও অব্যাহত সেই সংগ্রামের অন্তস্থলে দাঁড়িয়ে যে কবিতা রচিত হয়েছে সেই কবিতাগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করেছি। সেই সব তরুণ কবিদের কবিতাই নিয়েছি যাঁরা যুগবিচারে প্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নেই।

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তিনজন কবি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। এই তিনজন হচ্ছেন অমিয় চট্টোপাধ্যায়, তুষার চন্দ্র এবং দ্রোণাচার্য ঘোষ। এঁদের তিনজন কবিকে কারাগারে ফ্যাসিস্ত সরকার নিহত করেছে। অমিয় দীর্ঘদিন বেহালার শ্রমিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। তুষার ছিলেন রানীগঞ্জ খনি শ্রমিকদের একজন প্রিয় নেতা। দ্রোণ বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। হুগলী জেলার এক গরিব কৃষক পরিবারের সন্তান।

আমাদের বেশ-কিছু কবি এখন জেলে আছেন। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে।

এই সংকলনে কয়েকজন শ্রমিক কবি আছেন যাঁদের পরিচয় পৃথকভাবে দিতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো হত। কেননা তাঁদের কবি-চেতনা এবং কাব্যিক আবেদন যে কত সুদূরপ্রসারী তা অনেকের পক্ষেই উপলব্ধি করা সহজতর হত। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

আমরা কমিউনিস্টরা দেশকে বিমূর্ত ভাবে দেখি না। আমাদের কাছে আমাদের দেশ জীবন্ত, সবাক—কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের আবেগ, ভালোবাসা, ক্রোধ, ঘৃণা—তাদের সংগ্রাম অভ্যুত্থান। আমাদের দেশ হচ্ছে সেই অগ্নিময় বিক্ষুব্ধ মানুষের দেশ। এই দেশকেই আমরা ভালোবাসি, তার জন্যে সংগ্রাম করি এবং তার জন্যেই কলমকে হাতিয়ার হিসেবে তুলে নিই। এই কবিতা সংকলন সেই স্বদেশেরই অগ্নিময় স্বাক্ষর।

সূচীপত্র

অমিয় চট্টোপাধ্যায় ॥ উত্তরের আগুন ... ৯
সুমন মুখোপাধ্যায় ॥ আগুন, এর পরেই ... ১০
দুর্গা মজুমদার ॥ আমি সে রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই ... ১২
সমীর রায় ॥ দুষ্টু দুষ্টু চোখ নুরুলটা ... ১৪
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥ যদি বিদ্ধ হয় ... ১৬
কমলেশ সেন ॥ এক লক্ষ সজ্জিত মানুষ উত্তরের মাঠে ... ১৯
বিষ্ণু বাগ ॥ সামনে ধানের বুকে ... ২০
বিজয় ঘোষাল ॥ আগুন ... ২২
শেখ আব্দুল জব্বার ॥ শুধু পথ চলা নয় ... ২৪
অসিত সরকার ॥ তোমার মুখ ... ২৬
সুজিৎ ঘোষ ॥ অ্যান্টিয়ুসকে ... ২৭
নিতাই শিকদার ॥ উজ্জ্বল গানের তরঙ্গ ... ২৮
রবীন্দ্র সরকার ॥ জানালাটা খুলে দাও ... ২৯
শৈবাল মিত্র ॥ মৌনতার বিরুদ্ধে ... ৩১
ধ্রুব মুখোপাধ্যায় ॥ অঙ্গীকার ... ৩২
নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ॥ চলচ্চিত্র ... ৩৪
ভজন দাস ॥ বিক্ষুব্ধ জুলাই : ভারতবর্ষ ... ৩৫
বিজন চৌধুরী ॥ উত্তর বাঙলা ... ৩৬
বীরেন্দ্রনাথ সরকার ॥ এখানে সময় ... ৩৭
কৌশিক বসু ॥ আমি দেখে যেতে চাই এক অনন্ত দিন ... ৩৮
নির্মল ব্রহ্মচারী ॥ দিগন্ত ... ৩৯
শঙ্কর মিত্র ॥ আগুন যদি জলে ... ৪১
মিহির ভট্টাচার্য ॥ মালিনীরা এখন ফুল ছড়িয়ো না ... ৪২
তুষার চন্দ্র ॥ কমরেড গ্রিমাউকে ... ৪৩
মাণিক ঘোষ ॥ ঝড় উঠছে ... ৪৪
জীবন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ভাষণ ... ৪৫
শ্যামল রায় ॥ এখন : সময় ... ৪৬

বিদেশ দেবনাথ ॥ কিষাণ মেয়েদের গান ... ৪৭
অজিত মুখোপাধ্যায় ॥ আমরা জীবন দিয়ে ... ৪৮
সাগর চক্রবর্তী ॥ আউনি বাউনি ... ৫০
নিমাই ঘোষ ॥ একদিন সূর্য উঠবে ... ৫১
শংকর দেবদাস ॥ তোমরা যখন ... ৫২
রবীন্দ্র চক্রবর্তী ॥ লাখে একজন হতে চাই ... ৫৩
দিলীপ দে ॥ ছাব্বিশে জুনের ময়দানকে মনে রেখে ... ৫৪
আলোকজ্যোতি রায় ॥ আগামী কোনো দিন ... ৫৫
অলোক সিংহ ॥ রাশ রাশ উজ্জয়িনীর ছায়া ... ৫৬
দীপেশ চক্রবর্তী ॥ ভিয়েতনাম ... ৫৭
সব্যসাচী দেব ॥ বেন হাই নদীকে ... ৫৮
নারায়ণ সরকার ॥ আবার আসিব ফিরে ... ৬০
দেবেন দোয়ারী ॥ একটা ছবি আঁকতে চাই ... ৬১
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শোকার্ত হৃদয় নয় ... ৬২
সমীর ইন্দ্র ॥ না, আর কান্না নয় ... ৬৩
সৃজন সেন ॥ ত্রিকিমা পাহাড়ে রাইফেলের গর্জন শুনে ... ৬৪
অমিতদ্যুতি কুমার ॥ এবার হাতে তূণ নিয়েছি ... ৬৬
অলক সেনগুপ্ত ॥ অনন্ত পথ ... ৬৭
স্বপন মালাকার ॥ সূর্য সাধ ... ৬৮
পবিত্র ভট্টাচার্য ॥ ইয়েভতুশেংকোর উদ্দেশে ... ৬৯
দ্রোণাচার্য ঘোষ ॥ বস্তুত এখন প্রয়োজন ... ৭১
রঞ্জিত গুপ্ত ॥ জেলখানা ... ৭২
ইন্দ্র চৌধুরী ॥ ওরা জানতো না ... ৭৩
কল্যাণী সেনগুপ্ত ॥ ভাস্বর হৃদয়ে ... ৭৫
মধুমিতা মজুমদার ॥ ওরা আর কাঁদে না ... ৭৬
অভীক গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ভোলা যায় না ... ৭৭
ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায় ॥ জেলের গরাদ ধরে ... ৭৮
অমিত দাস ॥ শীতের কোলকাতা : ১৯৭১ ... ৭৯
অলোক বসু ॥ তবু আলোকিত তোমার মুখ, কেননা ... ৮০

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

উত্তরের আগুন

....

সমস্ত ফুলগুলো ফুটে উঠলো
সমস্ত আগুনগুলো জলে উঠলো
মানুষ মুখর হল অন্ধকারের গ্রন্থি খুলে
ফুল আর আগুন জললো উত্তরের উৎরাইয়ে
বেদনা আর ভালবাসা আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে
সূর্য তার সাক্ষী হয়ে আকাশে মুক্তি জানিয়েছিল।

জোর করে তুষ দিয়ে ঢেকে রেখে
অনেকগুলো বসন্ত দাবিয়ে রাখা যায়
কিন্তু সূর্য অন্ধকারের অবসান করবেই
ফুল ফুটবেই
আগুন জলবেই।

সমস্ত অন্ধকার মৃত্যুর দিকে
সমস্ত ফুল
সমস্ত আগুন
এই সব প্রেম
কেননা এখন তারা পৃথিবীর সমস্ত রূপসীকে নিয়ে
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করছিল।

সুমন মুখোপাধ্যায়

আগুন, এর পরেই

....

মিছিলে দেখেছিলাম তাকে, সেই তীব্র মুখ, বাঁচার কঠিন ভঙ্গিমা।
খররৌদ্রে শূন্যে মুঠি ছুঁড়ে ছুঁড়ে এগিয়ে চলছিল যে,
জমানা পাল্টাতে হবে এই ছিল তার ভাষা।

ময়দানে আলাপ, তারপর পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর।

নাম তার চন্দ্রনাথ।
দেশ বসিরহাটে, বর্তমানে ম্যাক্নন্ কোম্পানির ভাইস-ফিটার।
মাঝে মাঝে জবরদস্ত হাত দুটো দেখিয়ে সে বলতো :
এ দুটোকে আমি বড় ভালবাসি।
আচ্ছা লোকে বলে ঐতিহ্য—হরদম শুনে শুনে
কান ঝালাপালা হয়ে যায়,
কিসের ঐতিহ্য, কাদের ?—প্রশ্নের আঁচড়ে আটকে থাকতো সে।
ময়ূরপঙ্খীর ঐশ্বর্যের মত জ্যোতিষ্মান চোখে ভেসে উঠতো তার
এ জন্মের ইতিহাস।
মাঝে মাঝে হেমন্তের স্থির নদীর মতো হঠাৎ শান্ত হয়ে যেত সে।
অনেক প্রশ্নের পর হয়তো কোনদিন সে উত্তর দিত :
আমার মাকে আরও কুড়ি বছর কাছে পেতে চাই।
প্রথমে অবাক হয়েছি তারপর বুঝেছি তার ব্যথা,
জেনেছি তার আকাঙ্ক্ষার প্রেরণার কথা :
মা তাঁর তিন কুড়ি বয়সের পার—রোগজীর্ণা।
এক সময় বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ছিলেন, সাহেবের গুলিতে
হারিয়েছেন ডান হাতের দুটো আঙুল। নির্যাতন, যন্ত্রণা দিয়ে
ভালবেসেছেন দেশকে। তবু আজ তাঁর কোন ক্ষোভ নেই—এই
নাকি স্বাভাবিক।

মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়েছি তাঁকে।
বাঁচার-সুরে ভরপুর হয়ে ফিরে এসেছি নিজের ঘরে।...

সময়ের স্রোতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আমরা...আমি আর চন্দ্রনাথ।
যে যার কাজে ব্যস্ত থেকেছি এ দুবছর।
তারপর আজ এই কারখানার গেটে দেখা,
উজ্জ্বল সেই বলিষ্ঠ মুখ, পুরু ঠোঁটের ফাঁকে প্রথম বর্ষার মতো কথা ;

লড়ুয়ে মানুষগুলোকে এখন কি করতে হবে—
ছাঁটাই মানে তো আর জীবন থেকে বাতিল হওয়া নয় !
গেট-মিটিং-এর পর জড়িয়ে ধরলো সে।
একে একে বলে গেল সব কথা
সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে মিশে গেলাম আমি আর কয়েক শত
ছাঁটাই শ্রমিক,
ভাঙাচোরা কতকগুলো মুখ,
কতকগুলো মুখে পলিমাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ—
আর কে যেন পাশ থেকে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো :

আগুন, এর পরেই।

দুর্গা মজুমদার

আমি সে রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই

....

আমাকে বিশ্বাস করো বিস্মিত না হয়ে
হে বসন্ত,
সত্যই বলছি আমি কিছুদিন ধরে
আমার এ বাঙলায় আপাতত শুনতে চাই না
তোমার শাখার শব্দ ঝনন ঘ্রণন,
আমার কথাকে তুমি বাঙলার কথা বলে মেনে নাও দ্বিরুক্তি না করে।
হে বসন্ত
সত্যই বলছি আমি কিছুদিন ধরে
আমার এ বাঙলায় আপাতত দেখতে চাই না
সবুজের সমারোহ তোমার হিল্লোল...

আমার সমস্ত দেশ
দেশের সমস্ত পথ
পথ থেকে শুরু করে
গাছের সমস্ত দেহ ডালপালা এমনকি পুরনো পাতাও
শ্মশানকালীর জিভের মতোই
টকটকে লাল হয়ে আছে
আমার অনেক ভাই
আমার অনেক বোন
আমার অনেক প্রিয় পরিজন সাথী আর সুহৃদের রক্তে।

আমি সে রক্তের দিকে
তাকিয়ে থাকতে চাই—আমার সমস্ত দিন সমস্ত নিশীথ।
কারণ সে রক্ত থেকে জন্ম নেবে—জন্ম নেবে জানি—
মেঘের আঁচল ছোঁয়া ফুলের আগুন

ফুলকি আনবে যার বাঙলার বনে নয়, মনেও ফাগুন…
কিন্তু তুমি নেমে এলে…আমার এ বাঙলায় তুমি নেমে এলে
হে বসন্ত
সবুজের সমারোহ আমার দৃষ্টির ধারা যদি প্রতিহত—
প্রতিহত হয়ে যায় অবুঝের মতো !
বাঙলার মন থেকে বিদায় যখন তুমি নিতেই পেরেছ
বাঙলার বন থেকে আপাতত তুমি
বিদায় নিতে কি
পারবে না
হে বসন্ত !

সমীর রায়

তুষ্টু তুষ্টু চোখ নুরুলটা

....

ইছামতী তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস
রোগে শোকে ভুগতে ভুগতে
তোর বুকের আঁচিলটা আরো নোংরা হচ্ছিল

লখিন্দরের লোহার ঘরে রাইফেল হাতে মানুষের ফিস-ফিস শব্দ
রাইফেলের হাতলে ইয়াঙ্কিদের মাতৃভূমির নাম

ইছামতী, আমরা বাঙলা দেশের মানুষগুলো যন্ত্রণায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে
মায়ের মুখ, নদীর জল, ভবিষ্যের স্বপ্ন এই সব এতগুলো কঠিন গতিকে
আবিষ্কার করেছি।
তবু আমরা সারা দেহের দিক থেকে দূরে ছিলাম
এখনো আছি
এখন ঠিক বারোটা
এখন ঠিক বারোটা
আমাদের সারা দেহে চাপ চাপ রক্ত।
তুষ্টু তুষ্টু চোখ নুরুলটা
অফিসে যাচ্ছিলাম
মালিককে সেলাম দেব ভাবছিলাম
স্ত্রীকে আদর করতে ভুললাম কেন ভাবছিলাম
ঠিক তখন বারোটা
ঠিক তখন বারোটা
আমাদের সবার গায়ে
তুষ্টু তুষ্টু চোখ নুরুলটা
বজ্জাতি করে রক্ত ছেটালো।

(আহা, এমন বজ্জাত ছেলেগুলো বাঙলা দেশের উঠোনে উঠোনে
মায়ের চোখ, চাঁদের চোখ ভরে দিক)
আহা, আকালের বছরে বসন্ত ফুলকে সরিয়ে রেখে
নুরুলকে নিয়ে এল গাছ সিংহাসনে
আর দুষ্টু দুষ্টু চোখ নুরুলটা বজ্জাতি করে
বাঙলা দেশে আগুন ছেটালো
(আহা, এমন বজ্জাত ছেলেগুলো বাঙলা দেশের উঠোনে উঠোনে
মায়ের মুখ, চাঁদের মুখ ভরে দিক)

বুলেটের শব্দের পর অন্ধকার গাঢ় হলে সুইসবোর্ড জ্বালো
আর কোন বিচারের, বিকৃতির কথা শুনব না।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

যদি বিদ্ধ হয়

কতো হাজার বছরের রাত্রি
জন্ম হয়েছে এ রাতের বুকে আমার, আমার পিতার
এবং পূর্বপুরুষের। লণ্ঠনের মতো দীপ্তিমান ভালবাসা
এবং তার জ্বালায় জ্বালায় চিনেছি পথ, হাঁটতে শিখেছি
সতর্ক সাবধানে। রাত্রির শিশির জানে কতো ব্যথা
কতো অত্যাচার আর ক্ষুধার দাপাদাপি।

সেখানে কি ফুল ফোটে
যেখানে রক্ত ঝরে নিপীড়নে?
যেখানে রাত্রির বাদশা দাসত্ব শৃঙ্খল হাতে নিয়ে
চন্দ্রচূড় সাপের মতন বেঁধে রাখে জীবন এবং তার সৌন্দর্য
আর সেখানে দর্শন বলে: "নিয়তি কেন বাধ্যতে!"

তবু গোলাপ ফোটে…
কারণ রাত্রির বাদশার জন্যে গোলাপ এবং নিপীড়িতা
গোলাপ এবং তার অন্ধকার মন।

উগ্র বিষাক্ত এ জ্বালায় আর এ সৌন্দর্য বিকশিত হয়—
তা আমাদের এ জীবন। অত্যাচারিত অত্যাচারিতার ব্যথার শিল্প
গরম চোখের জল এবং বিদ্রোহী রক্ত,
যার উত্তাপ পুড়িয়ে দিয়েছে বাদশার রাজ্য, হারেম, দর্শন আর ধর্ম·
তাই গোলাপের পাপড়িতে ছাঁটাই-শ্রমিকের বিদ্রোহ চিহ্ন।

এক যুগ থেকে আমরা অন্য যুগে প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছি
মমতা যদি বিদ্ধ হয়, প্রাণ যদি কাঁদে,
প্রাচীন সৌন্দর্যে যদি ধ্বস নামে
তবু মনে রেখো
এ যুগের উপর দিয়ে নিশ্চয়ই বয়ে যাবে তরুণ রক্তাভ এক নদী।

কমলেশ সেন

একলক্ষ সজ্জিত মানুষ উত্তরের মাঠে

....

একটি,
একটি খবর ছড়িয়ে পড়লো
খেপে ওঠা মানুষের
একটি খবর।

একলক্ষ,
একলক্ষ সজ্জিত মানুষ
উত্তরের
উত্তরের পলাশ ফোটা মাঠে
তাদের,
তাদের বুকের আগুন
নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে
স্তূপাকার করছে।

আর,
আর পলাশের মতো লাল
লাল টকটকে
সেই আগুন
সেই আগুন
তাঁদের মুখের ওপর এক,
এক আশ্চর্য আবেগে
ছড়িয়ে পড়ছে

ছড়িয়ে পড়ছে।

সেই মানুষগুলো
সেই মানুষগুলো
একদিন,
একদিন তাদের ঘন-কালো,
ঘন-কালো চোখ নিয়ে
সমুদ্র
সমুদ্র খুঁজেছিল

এমন সময়
ঠিক এমন সময়
একদিন
সেই মানুষগুলো
অর্জুন বনের সেই মানুষগুলো
এক এক করে
তাদের হাতগুলো
বুকের সামনে
টান টান করে
পেতে দিলো।

তাদের,
তাদের পায়ের নিচে
মাটি
ঢেউতোলা মাটি,
তাদের মাথার ওপর
আকাশ
নীল নীল আকাশ,
তাদের বুকে
আগুন
লাল সূর্যমুখী আগুন,
তাদের চোখে

ভালবাসা
ঘৃণা
ক্রোধ,
তাদের হাতে
মেঘবরণ
মেঘবরণ গাণ্ডিব
পিঠে তূণ
অসংখ্য তূণ

একদিন
একদিন আর নেই
আজ নেই।

উত্তরের
উত্তরের মানুষগুলো
খেপে উঠেছে
খেপে উঠেছে

উত্তরের পলাশ ফোটা মাঠে
উত্তরের পলাশ ফোটা মাঠে
একলক্ষ
একলক্ষ সজ্জিত মানুষ

সজ্জিত মানুষ।

বিষ্ণু বাগ

সামনে ধানের ঝুঁকে

....

হে স্বদেশ, দিশেহারা উদভ্রান্ত স্বদেশ,
ঝাউ কিম্বা বিটপীর বনে
ছায়ারা উধাও সব
এ দারুণ খরার দুর্দিনে।
কালাহাণ্ডি কাঁদছে কঁকিয়ে
চাষা ভূষা মানুষের গ্রামে গাঁথা দেশ,
আমরা সবাই আছি বেশ রেশনের
ফুটো ব্যাগ হাতে।
ঘাম রোদ্ জলটুকু ছাড়া
এ স্বদেশ সকলের নয়
এই সার তত্ত্বটুকু বোঝার সময়
ঢাক ঢাক গুড়-গুড় খরার দোহাই,—
ছায়াটুকু হিমঘর কুলপি মালাই
ভাগ্যবান বোঝা তার ভগবান বয়।

কালান্তরী প্রগতির ছায়া মাখা মাখা—
মাছ নেই, সামুদ্রিক মাছের চাবুক
বাজারে চাবুক নেই চাবুক উধাও।
তবুতো অনেক আশা হে স্বদেশ,
ফুটি-ফাটা বুকখানা বাজায় স্বদেশ,
দৃপ্তবেগে আসে ওই
রিমঝিম বর্ষার ধারার মতো
জীবনের খবরেরা—খর্বরের নিশ্চিত মিছিল :
হাট লুঠ গাড়ি লুঠ খাবারের গাড়ি

এবার ছায়ারা লুঠ কালান্তরী প্রগতির ছায়া।
হে স্বদেশ, ডলারের ফাঁদে ফাঁদে
রুদ্ধশ্বাস কালাহাণ্ডি কঙ্কাল স্বদেশ,
সামনে ধানের বুকে আকাশের বিদ্যুতের আলো,
আলো মাখো ছিয়াত্তর স্মৃতি-বহ—
হে আমার উদ্বাস্তু স্বদেশ।

বিজয় ঘোষাল

আগুন

....

কাল রাতে আমার ঘরে আগুন লেগেছিলো
তরাই-এর জঙ্গলের মতো ঘন অন্ধকার
আততায়ীর মুখ আমি চিনতে পারিনি
ঘুমের ঘোরে এক সময় যেন দেখতে পেয়েছিলাম,
তাদের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

'আগুন' 'আগুন' আমি চিৎকার করে উঠলাম
শব্দ করে আগুন জ্বলছিলো
রাগে গর গর করতে করতে গনগন আগুন
বার বার লাফিয়ে পড়ছিলো আমার ওপর।

যেমন করে জতুগৃহ আর রাইখস্ট্যাগ পুড়েছিলো
তেমনি করে আমি নিদারুণ আর অসহায় হয়ে
আমার সামনে আগুন পেছনে আগুন
আমি ধিকি ধিকি করে আগুনে পুড়েছিলাম
তাকে রাখা লেনিন কি পুড়েছিলো ?

আমার মায়ের চোখ দুটো মনে পড়ছিলো
ভোরবেলার অস্ফুট নীল আকাশের মতো—
কিন্তু আমার চোখে কী ছিলো
আমার নষ্ট দু চোখে ?
কোন যাযাবর পাখির পাখা ঝাপটানো—
দূর থেকে ভেসে আসা কোন গানের শব্দ
আমি কিছুই দেখছিলাম না…কিছুই শুনছিলাম না…
আমার বুকে কী উত্তরের ঝড় উঠবে ?

কে উত্তর দেবে অহল্যা মা দ্রৌপদী বোন
প্রিয়তম অভিমন্যুর চাপ চাপ রক্তে
কবে লাল অক্ষরে শিলালিপি লেখা হবে ?

কাল আমার ঘরে আগুন লেগেছিলো
কাল তোমার ঘরে···তোমাদেরও ঘরে
তেমনি শব্দ করে
একদিন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা
বিরাট উঠানে পা ছড়িয়ে
মা আমার ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে বলবে :
'বাইরে দামাল ঝড়, বৃষ্টি পড়ছে
এই খোকা বাইরে যাবি না ?
আমার মাথা খাস
হুনানের প্রতিশ্রুতি দুপায়ে মাড়াস না।'

আমার মায়ের চোখে আমি সেই
আততায়ীকে দেখতে পেলাম :
উত্তর দেশ থেকে হেঁটে আসা
লাঙ্গল হাতে নিয়ে সজ্জিত কালের বলরাম ॥

শেখ আব্দুল জব্বার
শুধু পথ চলা নয়
....

শুধু লাখ কবর মাড়িয়ে এ পথ চলা নয়,
শুধু পথ চলা নয়, নিরবধিকাল এই দীর্ঘ যাত্রা নতুন উত্তরণ,
আমাদের চোখে আজো জড়ো হয় পরবের ভোরের উৎসব!

যদিও অস্তিত্বে, হৃৎপিণ্ডে বাসা বেঁধেছিল ক্ষয়,
হাড়-মাস কুঁরে সর্বনাশের পোকারা ঠেলে ঠেলে তুলেছিল মাথা
তবু এলো বেদনার দীর্ঘ মহড়ায়, এলো মশালের মতো অগণ্য হাতে হাতে
আরোগ্য মুক্তির সেই গাঢ় আকুলতা—

আমরা সুস্থতার জোরে ফিরে যেতে চাই, উদ্বেগ-বিশুষ্ক মুখ
নির্মল হাওয়ায় খোঁজে শ্বাস,
চৈতন্যের পাপ এসে আচ্ছন্ন করেছে সাথীদেরও
এই পাপ, এই গ্লানি আমাদের মৃত্যুর মতো ভয়াবহ ক্ষয়।

এলো ক্ষুরধার শাণিত যুক্তির মহা অস্ত্র, এলো মুক্তির দীপ্ত অভিযান
দ্বিখণ্ড হয়ে গেল অস্তিত্বের দেহ,
আমরা বিচ্ছিন্ন আজ দুই মেরু, দুই কেন্দ্রে জন্ম ও মৃত্যু যেন পাশাপাশি
ঘেঁষাঘেঁষি
মধ্যে রইল প্রতি যুদ্ধের রণভূমি আর দীর্ঘ মহড়ার প্রস্তুতি।

শোকের মহড়া দীর্ঘ দীর্ঘ হতে বিমূঢ় হল ঢের জনতা,
'এ বিচ্ছেদ, এ আত্মব্যবচ্ছেদ কেন? একি স্বাস্থ্যের না আত্মহননের
এই গূঢ় প্রহসনের কোথায় উত্তর?

তারা উদ্‌ভ্রান্ত, তীক্ষ্ণ শতচোখে আমাদের চোখে চোখে খুঁজল উত্তর

দেখল, অতলে নির্ভরতার সেই গাঢ় আলিঙ্গন,
আমাদের এই চোখ আর চোখ নয়, সে যে অভ্রান্ত তারার এক অপরূপ-রূপ,
লাল ও উজ্জ্বল
আর পাশে কদাকার প্রাণীদের গলিত, জীবাণুকীর্ণ, বিচ্ছিন্ন
আমাদেরই দেহের খণ্ডাংশ,
সর্বনাশের শব্দে সাপটায় কালো ডানা ঝড়ের আকাশে।

নিরবধিকাল আর ঘুমের গুহায় নয় বাস,
আজ শুধু জাগরণ চেতনায় চেতনায় উদ্বেলিত শাণিত জনম
রাতের সুষমা আর সুদৃঢ় বাহুর বেষ্টনে প্রত্যাশার সুনিবিড় চোখ দুটি ভরে
ঘনঘোর বাষ্পাকুল মেঘের বিস্তার

নামে, বিষ্টি নামে
ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষণের জন্মের নির্যাস!

অসিত সরকার

তোমার মুখ

....

[মার্কস আনা-কে]

তোমার মুখ যেন সেক্যেরাসের আঁকা কোন ছবি : শিপ্রার সলিলে সেই
অজন্তার অবন্তী শ্রাবণ ঝরঝর
যেন ক্রন্দসীর মেঘ

তোমার মুখ যেন গিলেনের লেখা আশ্চর্য কোন রক্তাক্ত সংগ্রাম : যেন
আদিম অরণ্য আফ্রিকার নির্জন
নিঃসঙ্গ সমুদ্র সৈকত

আহা, তোমার মুখ যেন আমার হৃদয়ের নিবিড় ভালবাসা।

সুজিৎ ঘোষ

অ্যান্টিয়ুসকে

....

[আমি মনে করি বলশেভিকরা গ্রীক পুরাণের বীর অ্যান্টিয়ুসের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তারা, অ্যান্টিয়ুসের মতোই বলশালী, কারণ তারা তাদের মাতা জনতার সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। স্তালিন]

অ্যান্টিয়ুস, মাটিতেই তোমার জীবন।

আমিও বিচিত্র গন্ধ ভোরালী বাতাসে
সে মাটির স্বাদ ভালোবেসেছি যে কতো দিন।
রক্তঝরা সভ্যতার স্বর্ণসন্ধ্যা শান্ত স্তব্ধ হবে।
পলাতক প্রকৃতির নিকোনো উঠোনে
বাতাসের ঢেউ সব খেলা করে সারা দিনরাত;
স্থিত রাত্রি শান্ত নীরবতা পুবালী আলোর বর্শা ছিন্ন করে,
ধান খেত সবুজ ফসলে সারাদিন কথা বলে সময়ের কানে।

অ্যান্টিয়ুস, এ আকাশ ফসল ধান সব আমাদের,
মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা তাই মোর সুদীপ্ত শপথ।
যেখানে সুপর্ণা নদী পলি মাখে সারা দিনরাত,
যেখানে সুনীল নিরুদ্দেশ আমাদের পূর্বপটভূমি,
গাঙশালিখের সাথে যেখানে উড়ে গেছে সুশ্বেত কপোত,
সেখানে যুবক প্রাণ আমাদের
সুপর্ণা নদীটিকে ডেকে নেবে প্রথম আলোয়।

অ্যান্টিয়ুস, চলো আজ ভুলে যাই সোনালী আকাশ।
অ্যান্টিয়ুস, মাটিতেই তোমার জীবন
মাটিতেই আমারো, জীবন সকলের॥

নিতাই শিকদার

উজ্জ্বল গানের তরঙ্গ

....

বাতাস ভারাক্রান্ত
চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম,
কেননা রাত্রির বুক চিরে ঝড় আসছে
সামুদ্রিক ঝড়।
দুরন্ত শিশুর দল ঘুমিয়ে নেই আর
পৃথিবীর বুকে কান রেখে আমি
গান শুনছি, গান
আসন্ন রক্তিম সকালের গান।
ইতিহাসের অনেক নায়ক নিহত এখানে
আমার মানস দর্পণ আঁকে তার মুখ।

হে সাথী, হে বন্ধু,
তোমাদের দীপ্ত স্বপ্নেরা
আমাকে পরিয়ে দিক সূর্যের বেশ;
তারপর আমি
নগর গ্রামে মাঠে প্রান্তরে
মুক্তকণ্ঠে গাইব, উজ্জ্বল আলোকে গাইব,
বিমুক্ত বাতাসের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে দেব
আমাদের সূর্যদীপ্ত গানের তরঙ্গ॥

রবীন্দ্র সরকার

জানালাটা খুলে দিও

....

জানালাটা খুলে দিও।
বহুকাল ওরা সূর্যের মুখ দেখেনি
যে সূর্যকে ওরা আজও ভালবাসে—
পিতাপ্রপিতামহের বিন্দু বিন্দু রক্তের দাবীতে
রেখে গেছে অধিকার।
অথচ কি আশ্চর্য—
ওদের ঘরে নেকড়ের থাবার মত
অভিশপ্ত অন্ধকার বন্দী হয়ে
শপথের জানালা খোঁজে।

কবে এক দুর্গম পাহাড় চূড়ায়
কাঁধে কাঁধ দিয়ে দেখেছিল
সূর্যের মুখ অফুরন্ত আলো
আলোর জোয়ার…
অনাগত ফসলের গান শুনে
স্বপ্নে বিভোর হয়ে বলেছিল
'ভালবাসি, ভালবাসি জননী জন্মভূমি।'

তারপর স্বপ্নের টুঁটি টিপে
কারা যেন দরজা বন্ধ করে দিল
করাত দিয়ে কাটার মত
হাঙ্গরের মিহি দাঁতে
কি বীভৎস হাড় কাটা শব্দ
চারদিক নিস্তব্ধ আদিম যন্ত্রণায়

কঁকিয়ে উঠল :
আলো দাও—আলোর আর্তি
আমাদের জন্মগত অধিকার…।
পরিণামে নির্লজ্জ মিথ্যার কালি
ছিটিয়ে দিল ওদের চোখে মুখে।

তাই এক অতৃপ্ত বেদনায়
আজও ওরা মুক্তির প্রতীক্ষায়
কান পেতে দেওয়ালের কথা শোনে
কারা যেন এই পথে যাওয়া আসা করে
অন্ধকার দুলিয়ে দুলিয়ে
বজ্রকঠিন স্বরে এক সাথে হাঁক দেয় :
'জানালাটা খুলে দিও।'

শৈবাল মিত্র

মৌনতার বিরুদ্ধে

....

মৃত্যু তোমায় ভুলে যাবো নীরব অভিমানে
অসম্ভব, হে বিজেতা এমন অসম্মানে
কেমন করে ভোলাতে পারে স্নিগ্ধ নীরবতা,
কে যেন কাল বলেছিল—সত্য, মানবতা
রক্তপাতে কলঙ্কিত হবার মতো নয়,

হত্যাকাণ্ড তবুও ঘটে এবং মরার ভয়
বুদ্ধি এবং বোধে তোলে দারুণ আলোড়ন
তখন কে হায় মানবতা করবে আহরণ
আমার জন্যে কিসের মূল্য—আত্মসমর্পণ
নীরবতায়, মিছিলে হবে প্রতিমা বিসর্জন
সংগ্রামের, অন্ধকারে ফিরতে হবে বাড়ি
লড়াই যখন বারণ হলো—মারবে মহামারী

কিসের জন্যে মৌনতা কিসের জন্যে শোক
তোমার রক্তপাতের গর্ভে আমার জন্ম হোক।

ধ্রুব মুখোপাধ্যায়

অঙ্গীকার

....

আমরা সবাই সমবেত ময়দানে।
মিছিলে মুখর নগরী ;
রৌদ্রতপ্ত দিন।
সমস্ত বাঙলা আজ সমবেত ময়দানে।
গ্রামপ্রান্তরে অজস্র মানুষ
আজ আমাদের নায়ক।
সমস্ত নায়ক আজ ময়দানে জমায়েত।
আর ওদের চোখে মুখে
দুরন্ত দুর্বার শক্তি—প্রচণ্ড আকুতি
সারা কোলকাতা আজ হানয়ের সাথী,
প্রচণ্ড পিকিং আজ সকলের স্মৃতি।
অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোয়
পতাকাগুলো ঝলমল করে উঠলো।
গনগনে আগুনের শিখার মত
প্রতিটি রক্তকণিকায় স্পন্দন জাগিয়ে।
ওরা বয়ে এনেছে নির্ভরতার সংবাদ
প্রিয়তমার চোখের মত
জননীর ভালবাসার মত
আমার সবুজ বাঙলার গ্রাম প্রান্ত থেকে।
শেষ সূর্য অস্ত গেল
দু-একটা নক্ষত্র একে একে বেরিয়ে আসছে
সংগ্রামী অভিনন্দনের মত
দূরের গহ্বর থেকে।
তাদের তির্যক রশ্মিতে

এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার
সংগ্রামী মানুষের বিদ্যুৎ বিপ্লব দৃষ্টি।

আমরা পরস্পরকে লাল উষ্কিতে চিনলাম
প্রতিজ্ঞা করলাম,
সংগ্রামী ইতিহাস আর যেন বিশ্বাসঘাতকতায়
কলঙ্কিত না করি।

সঙ্গী সাথী সবার কঠিন চিবুক,
ঝলসানো দৃষ্টি থেকে অজস্র অভিশাপ আর ঘৃণা
ঠিকরে বেরিয়ে আসছে
বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতালোভী শাসকের বিরুদ্ধে।
দুর্জয় শপথ আজ বিক্ষুব্ধ জনতায়.
'প্রতিধ্বনির তরঙ্গ' আর 'চোখের তারায়।'

নৃপেন চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

....

চলচ্চিত্র দেখছিলাম
এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্র
মাথার উপরে ঈগলপাখি
আর জলের থেকে হাঙর—
আকাশ আর উপকূলভাগ
আক্রান্ত।
ঈগল আর হাঙরের সাঁড়াশি অভিযান
ভাবলাম
দেশটা বুঝি রসাতলেই গেল।

তবু কি আশ্চর্য।
দক্ষিণ সমুদ্র-ঘেরা দেশ
নারকেল গাছের বেড়া-দেওয়া দেশে
মাথার উপরে শিমুলের গুচ্ছ নিয়ে
ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর এক সংগীত
অসংখ্য যূথের পায়ের ছন্দে
মুক্তি-সঙ্গীত
শুনতে গেলাম।

আর দেখলাম
ঈগল আর হাঙরের দল
আহত…প্রতিহত…
প্রতিহত হয়ে পাততাড়ি গোটায়।

ভজন দাস

বিক্ষুব্ধ জুলাই : ভারতবর্ষ

আমরা চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুয়ে দাঁড়িয়ে
কলেজ স্ট্রীটের আকাশে ধোঁয়া

ওখানে ট্রাম পুড়ছে
চারিদিকে পুলিশ আর পুলিশ-ভ্যানের আর্তনাদ ছোটাছুটি

বাঙলার রাজকুমারেরা ওখানে দুহাতে
রক্তচোষা দৈত্যদের প্রাণভোমরা পিষছে।

জুলাইয়ের আকাশ মেঘলা
কার্ফুর সন্ধ্যা নামলো
চারিদিকে অন্ধকার মরণ গোঙানি বিভীষিকা
আমরা শিশুর মত স্থির বিশ্বাসের ঘুমে চোখ বুজলাম।

দু হাতে ইতিহাসের গলা জড়িয়ে
আমরা কাল আবার গল্প শুনবো
রাজকুমাররা দৈত্যদের টুকরো টুকরো করে
কত কালের বন্দিনী রাজকন্যাদের···

বিজনবন্ধু চৌধুরী

উত্তর বাঙলা

....

বহু পুরোনো এক বনেদী পরিবারের কথা—
রীতিমত ইতিহাসের স্বাক্ষর নিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত
অসংখ্য কথা-কাহিনীর আবছা আলপনা :
জলরঙে আঁকা বিলীয়মান গুহাচিত্রের
অপরূপ ব্যঞ্জনায় নানা ধীর ছন্দে
কালের হাতে প্রবিষ্ট।

এখানে শীতের সীমান্ত
বসন্ত আর শরতের দর্পণে নেচে ওঠে, গান গায়
কিন্তু জড়তা বারো মাস!
বর্ষার কান্না বিষণ্ণ গানের মত
ঝিরি ঝিরি একটানা—
তিস্তা, তোরষা, মহানন্দা প্রতি বর্ষার অসহ্য যৌবনে
বার বার ঋতুমতী হয়েও বন্ধ্যা।

এখানকার
নানা বিদ্রোহের ছোট ছোট ঘটনার আবহসঙ্গীতে
স্বপ্ন সত্যি হয়েছে বারবার ;
কিন্তু জীবনের কান্না থামেনি।

কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে
ঘুম ভাঙছে শত শত বছরের বন-মর্মরের
দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশে ভোরের সূর্য প্রদীপ্ত—
শাল সরল দেবদারু বনের কালো ছায়ায়
আলোর নাচ।

—কান্না থামবে।

উত্তর বাঙলা,
ঝঞ্ঝাহত বাঙলাদেশের এক সম্ভাবনাময় প্রান্তর।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

এখানে সময়

....

উৎপীড়নের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে
উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের উপর শুয়েছিলাম।
তখন সন্ধ্যা শেষ হয়।
এই তিরিশ মিনিট
নিটোল শান্তির সময়
আলো অন্ধকার রহস্যপুরীর কথা
ভাবতে ভাবতে
ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
ঘুঘুর মত সময়
ঠিক, আধ ঘণ্টার মাথায়
ফের
সযত্নে বসায় : যেখানে
উষ্ণ ক্ষুরধার বাবরির সঙ্গে
দুধের মত তেল জল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে,
যেখানে
চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে
হৃৎপিণ্ডের ধক ধক থেকে
সঞ্জীবন রক্ত মেশিনের গভীরে,
যেখানে
মেশিনের গভীরতা থেকে
কালো টাকার অদৃশ্য ঝর্না প্রবাহিত হয়
ঠিক, সেইখানে
কাজের জন্য সযত্নে বসায়।

কৌশিক বসু

আমি দেখে যেতে চাই এক অনন্ত দিন

....

আমি দেখে যেতে চাই
শতাব্দীর শেষ রাত্রি···
তারপর···
হরিৎ পাতার ওপর সহস্র সূর্যের উদ্ভাস
তারও পরে
দিন
অনন্ত দিন।
আফ্রিকায়
আমেরিকায়
অথবা ভারতে
প্রতিধ্বনিত শেকল ছেঁড়ার শব্দ
নীলিম অন্ধকারে হাওয়া বয়ে আনে
ঝড়ের সংকেত।···
আমি দেখে যেতে চাই—
শতাব্দীর শেষ রাত্রি···
দলে যেতে চাই অন্ধকার সম্রাটের মুখ
তারপর···
হরিৎ পাতার ওপর সহস্র সূর্যের উদ্ভাস
তারও পরে
দিন
অনন্ত দিন!

নির্মল ব্রহ্মচারী

দিগন্ত

....

আমার হৃদয়-মনের শেষ প্রান্তটুকু
কে স্পর্শ করবে বল ?
অন্তহীন আকাশের মত সে যে,
কেননা, দিগন্ত কেউ-ই স্পর্শ করতে পারে না
কখনও তোমরা কেউ কেউ আকাশে
মেঘের কোলে
টিকিট কেটে পাড়ি দাও দূর দিগন্তে...
প্লেনে করে বা রকেটে চড়ে চলে যাও সুদূরে কখনো
কিন্তু তাও কতক্ষণের জন্যে ?

মুঠো মুঠো ভাবনা ও জিজ্ঞাসার
মেঘমালা বিঁধে
আমার আকাশেও তেমনি কিছু কিছু যাত্রী
পাড়ি দেয়
সন্তুষ্টির টিকিট কেটে প্রীতি ও সম্পর্কের হাওয়াই গাড়িতে
বসে
কোন বৈমানিক কখনও আবার
দ্রুতগতির রেকর্ড করে—গ্যাগারিন টিটভও হয়
হয়ত
অনেকের মতে বুদবুদ হয়ে না,
কিন্তু তাও কতক্ষণের জন্যে।

তবে,
অনাগত কাল ধরে চিরন্তন যেন আমার দিগন্ত লাল

রক্তিম স্বপ্নের দিগন্ত
তাই ক্ষণকালের বুদ্‌বুদ তা হয় কি করে ?

আমার হৃদয়-মনের সারা দেহে
জড়িয়ে আছে লেনিনের স্বপ্নের
সেই রঙিন দিগন্ত
স্তালিনের দীপ্ত তেজ দৃঢ়তার হ্যুতি ।

শঙ্কর মিত্র

আগুন যদি জ্বলে

অগ্ন্যুৎপাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, জীবনকে
যদি গভীর মমতায় ভালবাসা যায়,
জেনো, তোমরা যে যেখানেই থাকো
আমার প্রাণের উত্তাপ তোমাদের স্পর্শ চায়।
গোটা দেশ জুড়ে মহামারী আর কান্না
হায়েনার বীভৎস দন্ত আস্ফালন ;
সর্বনাশা পাশবিক উন্মত্ততা
বাতাসে বাতাসে অভিশাপ, আমার বুকের জ্বালা থামে না।
আমার দেশের নিবিড় নীলিমায়,
নিষ্ঠুর মাটিতে যদি আগুন জ্বলে
তবে ইতিহাসের জবানবন্দীতে হিংস্র দানবেরা পুড়বে
তিলে তিলে।

ভূগোলের সীমানা অতিক্রম করে,
শিশির-সিক্ত বকুলের গন্ধ ;
সন্ধ্যার প্রদীপে চোখ মেলে ভাববো
মিলবে না আর কবিতার ছন্দ।
উজানের বাতাসে আর্তনাদে
আর কিছু না পারুক
তবু যেন না করে ক্রন্দন ॥

৩

মালিনীরা এখন ফুল ছড়িয়ো না

মিহির ভট্টাচার্য

....

মালিনীরা এখন ফুল ছড়িয়ো না
গঙ্গার বুকে এখন নাবিকেরা পাল তুলে দাও
আমরা সেই সাত সকালে বেরিয়েছি
অনেক উজান ঠেলতে ঠেলতে
আমরা এখনও কলকাতার সীমানায়।

মালিনীরা এখন ফুল ছড়িয়ো না
তোমাদের ফুল বড় নিষ্ঠুর সুন্দর
আমরা পাহাড়ে চড়বো বলে
শুকতারা সাক্ষী রেখে কখন বেরিয়েছি
অথচ আমরা এখনও বাঙলার সমতলে।

মালিনীরা এখন ফুল ছড়িয়ো না
তোমাদের ফুল বড় মায়াবী
আমরা মানুষকে ভালবাসবো বলে
মায়ের কাছে কথা দিয়েছিলাম
অথচ আমরা এখনও আমাদের হৃদয়ে।

মালিনীরা অমন করে ফুল তুলো না
তোমাদের ফুলের খেলা দেখবো বলে
কোনো রমণীকে উজাড় করে ভালবাসলাম
অথচ আমার ভালবাসা
এখনও সবুজের সীমানার খোঁজে আকুল।

মালিনীরা এখন ফুল ছড়িয়ো না
আমার ভালবাসা এখন নাবিক হতে চায়
আমার দেশের মাটির গন্ধে মাতাল হতে চায়
এখন ভালবাসা আমার ফুল নয়, ইস্তাহার চায়।

তুষার চন্দ্র

কমরেড গ্রিমাউকে

....

কমরেড গ্রিমাউ তুমি সুখে নিদ্রা যাও
ফাঁসির মঞ্চে তোমার বিপ্লবী বার্তা
"পঁচিশটা বছর ধরে আমি আছি সাম্যবাদী দলে
মৃত্যুর মুহূর্তেও আমি আছি ঠিক তাই।"
লেখা থাক জ্বলন্ত অক্ষরে
সহস্র হৃদয়ে
জেলে বসে আমি এক সাম্যবাদী কবি
তোমার প্রতিজ্ঞা নিই
বজ্রের লেখনীতে।
'কমরেড গ্রিমাউ তুমি সুখে নিদ্রা যাও।'

মানিক ঘোষ

ঝড় উঠছে

মনে রেখ ঝড় আসন্ন।
দেখছ না
চারিদিকে কি গভীর নিস্তব্ধতা।

পশ্চিমের ঐ অস্ত-যাওয়া লাল সূর্য
সংগ্রামের ঘোষণাপত্র,
ঈশানের কালো মেঘে কালান্তরের অমোঘ সংকেত
—দিন বদলের পালা।

দেয়ালের ভাষা ওরা পড়তে পারছে না।
কি করেই বা পারবে—
বেবলিনের রাজা বেলশাজারও পারেনি।
নির্বোধ বেলশাজারের মতো
ওরা একদিন নিজেদের কবর খুঁড়বে।
কারণ,
অত্যাচারের মাশুল সবাইকে দিতে হয়।

আমি যেন সেই বন্দী ডানিয়েল—
দূরদর্শী বিচক্ষণ সেই যুবক।
যুগ-সংক্রান্তির শেষ পাদানিতে দাঁড়িয়ে
আমি যেন তিলে তিলে
ওদের নিঃশেষ হয়ে-যাওয়া দেখতে পাচ্ছি।
আর দেখতে পাচ্ছি
আর একটা সূর্যস্নাত দিন।

আকাশ স্তব্ধ
বাতাস চঞ্চল
সমুদ্র তরঙ্গহীন,
মনে রেখ ঝড় আসন্ন।

জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

ভাষণ

....

কমরেড, কোন দিকে তাকিয়ে আমাদের হাতের মুঠি
ক্রমশই শক্ত হচ্ছে
আশা করি আপনাদের আর সে কথা
বোঝাতে হবে না, কারণ
খিদের জ্বালায় পেটের নাড়ী জ্বলতে থাকলেই
চোখের সামনে ঈশ্বরের বদলে
মুনাফাবাজদের ঠাসা গুদোম
ভেসে উঠছে।
কোন ছেঁদো কথাতেই আজ আর
বুকের আগুন সামাল খাচ্ছে না,
অবস্থা বুঝে যারা
সুর পালটাতে চাইছে, যারা
'হিংসাত্মক ঘটনাবলীর' ছোঁয়ায়
নিজেদের নামাবলী অশুদ্ধ করবে না ভেবে
লম্বা লম্বা পা ফেলে
সব কিছু ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলতে চাইছে
আমাদের বুকের আগুন
তাদের নাগাল পাবেই।

কমরেড, মূল কথাটি কী, আশা করি
আপনারা সবাই জানেন, কারণ
আমাদের গায়ের রক্ত জল নয়—
সেদিন আশিস আর জব্বরের বুক থেকে
যা ঝলকে বেরুল তা জল নয়
এইটুকুই বোঝাতে হবে।

শ্যামল রায়

এখন : সময়

....

ভাঙা চোয়ালের কষ বেয়ে রক্তাক্ত দিনগুলিকে
শামুকের মন্থরতায় আর বিলম্বিত কোর না।
লাল বাড়ির সদরের দেউড়ীতে ঘণ্টা বাজছে
ঢং···ঢং···ঢং··· ।
জল্লাদের খাঁড়া হাতে ; ওরা আসছে
আসছে···আসছে···আসছে।
দিগন্তের মৈনাক ; ভালবাসার অমরেশ ;
প্রেমের অঞ্জনা ;
তোমরা জেগে আছো ?
···হ্যাঁ আমিও
কেউটের নীল বিষে কলিজায় ধরে নিত ঘুম ;
ডাক দিলে কেউ না কেউ আসবেই ! আসবেই !
এসপ্লানেডের নোনা জলে রুদ্ধশ্বাস কেরানীরা
কাশীপুর, দমদমে ঘর্মাক্ত শ্রমিকেরা
সেন্টপলসের মৃদু ভায়োলিনে কলকাতার বনেদী ঘুমকে
আর ফিরে পাব না
এখন জাগার সময়
এখন বাঁচার সময় ।
আর ফিরে পাবে না
এখন জাগার সময়
এখন বাঁচার সময় ।

বিদেশ দেবনাথ

ক্বিষাণ মেয়েদের গান

....

ভারতবর্ষের বিস্তৃত সীমারেখায়
হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ
খসে খসে খসে খসে নিভৃত সাগর :
হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ
খসে খসে খসে খসে…
ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিপাশার
শান্ত তীরে
যব আর গমের খেতে শীষ নড়ে ওঠে ;
যব আর গমের খেতে
তৃষ্ণার্ত কিষাণেরা লাঙ্গল চালায়
লাঙ্গল চালায় লাল পাহাড়ের নীচে;
আর কিষাণ মেয়েরা গান গায় :
আমাদের এখন জমিনে জল দেবার
দিন এসে গেছে।

অজিত মুখোপাধ্যায়

আমরা জীবন দিয়ে

....

আমরা জীবন দিয়ে প্রতিটি মৃত্যুকে মুছে দেব
আমাদের মৃত্যু দিয়ে সাজিয়ে দেব প্রতিটি জীবন

প্রতিটি রাস্তায় যুবকের রক্তচিহ্ন
রক্তে কাদা হয়ে গেছে মাটি
আমাদের পায়ে পায়ে অগণিত আত্মবিসর্জন
আমাদের বুকের ভিতর অসংখ্য শোকের দাগ,
আমাদের বন্ধু শহীদের নিশ্বাসে উত্তাপে স্বপ্নে
আদিগন্ত গাছপালা নদী বালিয়াড়ী এবং রাস্তার ধুলো
দিয়েছে মধুর করে,
হলুদ সবুজ পাতার দিকে চাইলে
প্রতিটি গাছের গন্ধ পেলে
হেঁটে গেলে ফাল্গুনের রাত্রে নদীর ভিতরে
আমাদের মৃত বন্ধুদের স্পর্শ পাই

রাস্তা আমাদের বাঁক নিয়েছে
সামনে প্রস্ফুটিত পলাশ
পাশে বাবলা ও বেনুবন
আমাদের অনেক অনেক পথ ভেঙে যেতে হবে
জ্বলন্ত বারুদে আমাদের চামড়া যাবে ঝলসে
আমাদের বুক লক্ষ্য করে আছে শত্রুর রাইফেল
যুদ্ধের আগুনে আমাদের পা ঝলসে গেলে
আমরা চলি হাত দিয়ে
শত্রুর বন্দুকে ভেঙে গেলে একটি হৃদয়

বন্ধু-শহীদের স্থানে ছুটে আসে অজস্র হৃদয়
আমরা অগণিত মানুষ তরঙ্গ
আমার একটি মৃত্যু জন্ম দেয় অসংখ্য জীবন
আমরা জীবন দিয়ে প্রতিটি মৃত্যুকে মুছে দেব
আমাদের মৃত্যু দিয়ে সাজিয়ে দেব প্রতিটি জীবন।

সাগর চক্রবর্তী

আউনি বাউনি

....

এখন উদাত্ত কণ্ঠে দীপ্ত পারিপার্শ্বিকের মালা
তাকাও নিবিড় চোখে যতোদূর উদ্ভাসিত রৌদ্রের সমতল জাগরণ
উত্তরে তরাই আর দক্ষিণের নিম্নভূমি নতুন আবাদ
সময়ের হাতে ঝলকায় বিদ্রোহী হাঁসুয়া
চন্দনদীঘির বোন অহল্যার শপথে

আমরা জেগেছি তাই ভোর হলো নবান্নের মাঠে মাঠে আমরা
শামিল, তাই জোর এলো কব্জিতে, আবার আমরা বাঁচবো
তাই পুরাতন ভূমিকায় আর খুশি নই অসন্তোষ ভোরের ধানের
মাঠে লক্ষ কণ্ঠে শঙ্খের মঙ্গল শব্দে বাজে ওঠে প্রতিধ্বনি

রক্তে রোয়া সোনাধান হাজার রক্তাক্ত গ্রামে আউনি বাউনি…

নিমাই ঘোষ

একদিন সূর্য উঠবে

....

এখানে একদিন সূর্য উঠবে
এখানে একদিন ফুল ফুটবে

ওদের অত্যাচার
ওদের বিষাক্ত নখের আঁচড়ে
প্রতিদিন আমার গা বেয়ে
রক্ত ঝরছে···

প্রতিদিন আমরা মরছি
প্রতিদিন আমরা বাঁচছি।
আমাদের বুকের প্রস্ফুটিত রক্তে
যে ফসল
সে তো আমাদের জন্যে।

হে আগামী দিনের মানুষ, তোমার
স্বপ্নকে তুমি
কাঁধে তুলে নাও ;
তোমার দুহাত শব্দময় হয়ে উঠুক
ছিন্নভিন্ন শৃঙ্খলে।

শংকর দেবদাস

তোমরা যখন

....

তোমরা যখন যন্ত্রণার পাহাড় নিয়ে হাত বাড়াবে
আগুন হয়ে…
তোমরা যখন ঘৃণায় ক্রোধে জ্বলে উঠবে
বারুদমালা…
থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ওরা তখন
পিছু হটবে।

তোমারা যখন মাটির বুকে আগুন হয়ে জ্বালবে আলো
টুকটুকে লাল
একটু একটু জ্বলতে জ্বলতে রাজ্য জুড়ে
জ্বলতে থাকবে…
তোমরা যখন চারদিগন্তে খুঁজতে থাকবে
শত্রু শিবির
ওরা তখন পিছু হটবে॥

তোমরা যখন যন্ত্রণার পাহাড় নিয়ে হাত বাড়াবে…

রবীন চক্রবর্তী

লাখে একজন হতে চাই

মৃত্যুর গান গেয়ে যদি তোমরা
শান্ত সমুদ্রের হৃদয়কে কাঁদাতে চাও
শিশুর মত অসীম নিরাশার শোকে
কাঁদবে না।
আমি দু পায়ে শোকের কাঁটা মাড়িয়ে
যৌবনের ধায়ে হাঁটতে চাই সম্মুখে
আমার হৃদয়কে নিয়ে।

তবে যদি কখনো একটি মহৎ মৃত্যুর কথা বলো
—সে মৃত্যুতে বসিরহাট থেকে শান্তিপুর
শান্তিপুর থেকে কলকাতা
সারাটা দেশ ভাসে বন্যায়
ঢল নামে তালগাছ-ঘেরা মরা বাঙলার বুকে

লাখ লাখ কান্নার ঢেউয়ে
আমি নিশ্চুপ থাকব না
আকাশ উজাড় করে অঝোরে কান্নায় ভাঙবো না।

তোমরা আমার চোখের জল মুছিয়ো না
আমি এক লাখের একজন হতে চাই।

দিলীপ দে

ছাব্বিশে জুনের ময়দানকে মনে রেখে

....

এমনি করেই বহু ইতিহাস প্রোথিত হয়েছে অতীতের ময়দানে।
সংগ্রামী জনতার লড়াইয়ের ইস্তাহারে বহু প্রতিজ্ঞা প্রতিফলিত
হয়েছে অতীতের সেই পৌরুষদীপ্ত নির্মেঘ আকাশে—আশা
আকাঙ্ক্ষা রূপ নিয়েছে প্রতিরোধমুখী চৈতন্যের স্বর্ণাভ সকালে,
ইতিহাসের প্রোজ্জ্বল মশালে ভবিষ্যত কথা বলে তাই।

সমুদ্রে নাবিক—নোনা জলে নাবিক। কম্পাসে দিকের ইঙ্গিত।
হাঙর আর ঢেউ—নির্জনতা আর কুণ্ঠা; এরই সঙ্গে যাত্রা।
বিশ্বাসঘাতকেরা সতর্ক থাকে, অশুভ মুহূর্তে পায়ের তলায়।
যাত্রার গৌরব আছে—সংগ্রামেরও। বিদ্রূপকে ভেঙে ফেলে
এ নাবিক তাই আগামী ভাগ্যের নায়ক।

সংগ্রাম—আমদের অধিকার। প্রতিদিন নিষ্পেষিত পাঁজরে
আমরা হামাগুড়ি দিয়ে বাঁচার জন্য ঐ প্রাসাদের চার দেয়ালে
ভিক্ষা চাই—অরণ্যে কাঁদি গলা ফাটিয়ে। বুভুক্ষা অধ্যুষিত
এ জীবন থেকে আজ—অনুনয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বকে মুছে
ফেলতে হবে। বাঁচার গ্যারান্টি : সংগ্রাম।

যদিও এ দিন নিশ্বাসরুদ্ধ, ফিঙের পালকের মতো। এখানে
প্রবহমান বাতাসের চোখে জল। গর্জন নেই মানুষের কণ্ঠে।
চেরাপুঞ্জি নেই কোথাও। নুন আর ঘাম। তবুও বিভীষিকাময়
মুহ্যমান এ পৃথিবীর বন্ধ্যা হৃদয়—গর্ভে সঞ্জীবিত প্রাণ,
মেশিনম্যানের শাবলের মতো শক্ত দুটো হাত দিয়ে সমস্ত
অবসাদ, অবিশ্বাসের কৃমিকীট টেনে ফেলে দেব
বাহির বিশ্বের আলোকের স্পষ্টতায়।

শ্রমিকের রক্ত আগামী দিনের সূর্যোদ্বোধন। সেদিন
আমাদের উন্মেষের দিন, উজ্জীবনের দিন, উত্তরণের দিন।

আলোকজ্যোতি রায়

আগামী কোনো দিন

....

সবই সম্ভব ছিল। একদিন রক্তাক্ত পতাকা
উড়িয়ে প্যারেড করবো, একদিন আমরা কেবল
বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবো, একদিন আমরা সবাই
নিরুপদ্রব থাকবো, সেই দিন নুরুল ইসলাম
'বাঙলা ছেষট্টি সাল' এই নামে তোমাকে চিনবো।
সেই দিন আনন্দ, তোমার মৃত্যুর কথা ভেবে
লোহিত পতাকা তুলে সাম্রাজ্যবাদীর রক্ত নেব।

সেদিন কেবল মনে হবে
তুমি বাঙলার ছেলে শুধু নও
তুমি কেরালার কোন চাষী
তুমি ভান ত্রই, তুমি নির্যাতিত এশিয়ার ছেলে।

তোমাদের রক্ত এসে আমাদের রক্তিম করেছে।

অলোক সিংহ

রাশ রাশ উজ্জয়িনীর ছায়া

মনে করো সমস্ত ভালবাসা নীলশূন্য অন্ধকার
ওদের কণ্ঠে তাই রাশ রাশ উজ্জয়িনীর ছায়া
মনে করো দীর্ণ ফুসফুসে বিষাক্ত বাতাস আর্তনাদে অধীর
কখন থেমে গেছে সমস্ত বিবেকের উৎসব
মৃত্যুর অনেক কাছে তাই চিরশূণ্য পৃথিবী
শৈশবেই একে একে সঙ্গীহারা হয়—
মনে করো সমস্ত প্রান্তর জুড়ে শ্মশান
পোড়া মাংসের গন্ধ
নারীর শরীর ছুঁয়ে নির্লজ্জ অত্যাচার এল—
যেন সূর্যাস্তের এক নদী ফসলের রঙ নিয়ে নিভে যাবে
তাই সেই দেশ সূর্যশিখা দিনশেষে পুড়ে পুড়ে মূর্ছিত পিতল হল
—বিধ্বস্ত প্রতিবেশে তবে সব স্বপ্ন ভেঙে যাবে !
কিন্তু পরাজিত আজ ট্রাপিজের মুখোশী খেলোয়াড়—
তাই হতাশার উল্কি আঁকা মুখে যখন মানুষের অভিশাপ
ইতিবৃত্তের কালান্তর পেরিয়ে মুক্তধারা আলো তখন
সমস্ত হৃদয়ে ভালোবার লক্ষ দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল—
শস্যহীন মাঠে আজ তাই ফসলের কি আশ্চর্য প্রকাশ
উজ্জয়িনীর ছায়াপথ দিগন্তে দিশারী নীহারিকা
নক্ষত্র ছুঁয়ে সমুদ্রের কলরোল খুঁজে চলে জীবনের শপথ,

আমার বুকে আজ নিপুণ ব্যথায় ভালবাসা
শুদ্ধ উচ্চারণে তোমার দিগন্তে ভিয়েতনাম
নতুন সূর্যে দেখে প্রসারিত রৌদ্রের সংকেত।

দীপেশ চক্রবর্তী

ভিয়েতনাম

পথটা লম্বা
ছেলেটা ছোট্ট
বেহায়া রোদ

কখনো মেঘ বা
কখনো বৃষ্টি
কখনো ঝড়

কখনো প্রলয়ে
ঝলকে অশনি
কি দুর্যোগ

ছেলেটা আহারে
ছেলেটা তবুও
থামবে না

পথটা লম্বা
হোক না বৃষ্টি
থাকুক রোদ ॥

সব্যসাচী দেব

বেন-হাই নদীকে

....

দেখ, দেখ
নদী
এপাড় জুড়ে ভালবাসা
শ্যামল প্রান্তরে হাওয়া
যৌবনের গান
হো চি মিন।

ছেলেবেলায় শোনা রূপকথা—
ওপারে বন্দিনী রাজকন্যা
মধ্যিখানে নদী,
বেন-হাই, বেন-হাই।

ধানের খেতে রাইফেলের শব্দ
হাঁটুভরা কাদা আর তমিস্র অরণ্যে
লড়াই

আগুনের মত উজ্জ্বল প্রতিজ্ঞা।
কবে সুখের দিন আসবে
গোলায় উঠবে ফসল,
আগামী দিন
চোখে স্বপ্ন
গেরিলার—

নীচু হয়ে নেমে এল প্লেন
একরাশ ধোঁয়া,

রাইফেলের মুখে-প্রতিবাদ গর্জে উঠলো
স্থানয় স্থানয়।

একটু একটু করে স্পন্দিত ভালবাসা
মা-এর কাঁপা কাঁপা হাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ,
শহরে
গ্রামে
ভিয়েতনামে।

দেখ, দেখ,
তোমার পাশে আমরা
এ ওর হাতে
কখন
রাখী পরিয়ে দিয়েছি।

দেখ, দেখ
সূর্যকে মুঠোয় ধরে
সারা বাঙলা দেশ
এখন
ভিয়েতনাম॥

নারায়ণ সরকার

আবার আসিব ফিরে

....

॥ বাংলার সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনের অমর শহীদদের
আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠস্বর ॥

আবার আসিব ফিরে এই বাঙলায়
সুপ্তির গভীর থেকে ডাক দিয়ে গেছে ইছামতী
আমাদের রক্তে-ভেজা মাটি
মায়ের চুম্বন যেন এঁকে গেছে ভাগীরথী—
জলঙ্গীর ঢেউয়ে-ভেজা বাঙলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়

আবার আসিব ফিরে

যখন রৌদ্রের স্বাদ ঘিরে
অজস্র ধানের গন্ধ—জীবনের
রক্ত-উপচারে
মার্চের দুরন্ত ইছামতী
ভাগীরথী
জলঙ্গী
সুপ্তির তিমিরে চিরসঙ্গী
ডাক দেবে ; আবার আসিব ফিরে
'বাঙলার নদী-মাঠ-খেত ভালবেসে।'

দেবেন দোয়ারী

একটা ছবি আঁকতে চাই

....

ইস্পাত কঠিন ঐ হাত দুটোর দিকে তাকাও
তাকাও বারুদ জমাট ঐ চওড়া বুকটার দিকে
রাক্তের জ্যোৎস্না ওদের শক্ত পেশীতে
কোন সোহাগের আঁচড় কাটে না
কেননা ওরা শ্রমিক।

মুষ্টিবদ্ধ ঐ সবুজ হাতগুলোর দিকে তাকাও
তাকাও মাটির মত রুক্ষ ঐ হাত দুটোর দিকে
চাঁদের জ্যোৎস্না ওদের রুক্ষ দেহে
কোন সোহাগের আঁচড় কাটে না
কেননা ওরা কৃষক।

তাই কি হবে আর চাঁদের সোহাগের গল্প করে
কি প্রয়োজন জ্যোৎস্নার শুভ্রতার
হাজার কবিতা লেখার
চাঁদের জন্যে আমার কোন মমতা নেই।

আমি হৃদয়ের রক্তে
সংগ্রামের তুলিতে
একটা ছবি আঁকতে চাই
নতুন পৃথিবীর।

একটা ছবি আঁকতে চাই শ্রমিক আর কৃষকের
রুক্ষতার আর শক্ত পেশীর।

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শোকার্ত হৃদয় নয়

....

হৃদয়ে আগুন জ্বলতে থাকবে, ঘৃণা
জাগতে জাগতে যতক্ষণ না ক্রোধ—
মায়ের আমার সুখ দুঃখের স্মৃতি থাকবে না
অশ্রু আমার মায়ের ওরা মোছাতে দেবে না
অবিচারের বোঝা বাড়বে ক্রমে ক্রমে
দুঃস্বপ্ন সহজে হবে না অতীত—
হৃদয়ে আগুন জ্বলতে থাকবে, ঘৃণা
জাগতে জাগতে যতক্ষণ না ক্রোধ।

সময় এখন দাঁড়িয়ে অধীর প্রতীক্ষায়
প্রহর গুনবে স্বদেশ আমার, যতক্ষণ না
লক্ষ মিছিল উৎসবে হবে লাল—
অচিরে হবে না অমারজনী অতীত
হৃদয়ে আগুন জ্বলতে থাকবে, ঘৃণা
জাগতে জাগতে যতক্ষণ না ক্রোধ।

সমীর ইন্দ্র :

না, আর কান্না নয়

....

(ধোড়ী কোলিয়ারির নিহত শ্রমিক ভাইদের স্মরণে)

মা, তোরা কাঁদিস নে
নরম হাতের শক্ত মুঠোয়
কালো কালো পাথরগুলো সরিয়ে দে
আমরা উঠে দাঁড়াই।

মাগো, না আর কান্না নয়!
তোদের চোখের জলের জমাট শিলায়
ওদের তুঙ্গ শৃঙ্গ লোভ আকাশ ছুঁয়েছে।
তার চেয়ে, আয়—
সামনের ওই ধোঁয়ার পাহাড়টা সরিয়ে দে
আমরা বুক ভরে দম নিই।

চোখের জলে এ আগুন আর নেভাস নে
আঁজলা ভরে ঘরে নিয়ে যা
মহুয়ার ডালে দোলনায়
আমার ছেলেটা দোল খাচ্ছে;
ওর হাতে মুঠোভর্তি আগুন নিয়ে দে
তাই দিয়ে ওর সঙ্গীদের নিয়ে
খেলতে থাকুক।

স্বজন সেন

ত্রিকিমা পাহাড়ে রাইফেলের গর্জন শুনে

....

ওরা ভেবেছিল
আগ্নেয়গিরিটা নিভে গেছে,
ওরা ভেবেছিল
ওদের শাসনের বেড়া দিয়ে
আগ্নেয় অঞ্চলটাকে ওরা চিরকালের মত বেঁধে ফেলেছে,
ওরা ভেবেছিল
খবরের কাগজে আত্মসমর্পণের ছবি
আর গাঁজাখুরি কাহিনী ছেপে
বোকা বানাতে পেরেছে সবাইকে।
কিন্তু কমরেড লেনিন বলেছিলেন :
মিথ্যে দিয়ে বোকা বানিয়ে রাখা যায়
কিছু লোককে বহুদিন
কিন্তু
সমস্ত লোককে বোকা বানান যায় না কখনও।
তাই আমরা আবার বারুদের ঘ্রাণ পেলাম—

ত্রিকিমা পাহাড়ের বুকে শুনতে পেলাম রাইফেলের গর্জন,
সে গর্জনে উপলব্ধি করলাম নিপীড়িত মানবতার বুকের দপদপানি
শুনতে পেলাম শৃঙ্খল ছেঁড়ার ঝনঝনানি শব্দ।
প্রতিবিপ্লবী হিংসার জবাবে বিপ্লবী রাইফেল যেই ধোঁয়া ছাড়ল
পাহাড়ের তল বেয়ে যখন ওদের দশটি শীতল দেহ গড়িয়ে পড়ল
তখন
কাপুরুষ ধমক আর সান্ধ্যআইনের চাবুকে
ওরা নত করতে চাইলো চির অবনত মানবতার উদ্ধত শিরকে।
কিন্তু, ওদের আতঙ্কিত চিৎকার

কমরেড মাওয়ের সেই অমর বাণীর সত্যকে আবার প্রমাণিত করলো :
সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা কাগুজে বাঘ
দেখতে তাদের জ্যান্ত ভীষণ
ভেতরে খড় আর কাগজের পুর।
নাগা মিজো পাহাড়ের সংগ্রামী বীরেরা—শাবাস!
তোমাদের বিদ্রোহ আমাদেরও জয়ের রক্তিম পতাকা
তোমাদের জয় আমাদের বিপ্লবের অগ্রগতি
নাগা মিজো আর শ্রীকাকুলামের পাহাড়ী পাতারা একই
সজীবতায় উজ্জ্বল।

নিপীড়িত মানবতার উর্বর ভূমিক্ষেত্রে
প্রতিটি বিপ্লবী বীজ হবে
প্রতিটি বনস্পতিই শীতল ছায়া ছড়াবে
সমতলের আর অসমতলের সংগ্রাম
এক ধারায় মিশে যাবে।
সেই ধারার উদ্দাম প্রবাহকে রোধ করতে
শত শত আশোয়ান বাঁধ নিভান্তই খড়কুটো!

অমিতদ্যুতি কুমার

এবার হাতে তূণ নিয়েছি

....

মুখে ভয়ের তুরুপ এঁটে
পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে
পারে কি কেউ পৌঁছে যেতে তিমির পার ?
মরতে না হয় সাধ নেইকো
বাঁচার মতো মন চাইতো
নইলে পরে বনেদঘরে বন্দী থাকে স্বপ্নচর।

এবার হাতে তূণ নিয়েছি
কাস্তে ফলায় শান দিয়েছি
মাটির পরে হাল চালাতে নেইকো আর মনের ডর
তোমরা যারা ভয়েই মরো
পুঁথির বুকে লড়াই করো
দেখতে কি পাও দুশমণেরা পাঁচিল তুলেও জড়োসড়ো ?

সাতকন্যার রক্তসাথে রক্ত এখন ঝরবে আরো
চুরুট মুখে পাইপ ঠুকে তোমরা না হয় এবার সরো
মন্ত্রীগিরির চকমকিতে আর দিও না মোদের ফাঁকি—

হাল না দিলে খেত হয় না পোড়োমাটি

না লড়লে গাড়া যায় না নিজের ঘাঁটি

ভিত নাড়াতে বনেদ ঘরের রক্ত লাগে জানতে না কি ?

অলক সেনগুপ্ত

অনন্য পথ

....

দম বন্ধ করে হাঁটতে হাঁটতে
হঠাৎ বাতাসের সমুদ্র থেকে
স্বপ্ন উঠে এল
আমার দু চোখের পাতায়।

আবহাওয়া হাল্কা হয়ে এলে
দেখতে পেলাম
একটি মাত্র দরজা খোলা :
মুক্ত বাতাস
পাতার বুকে চুমু খেয়ে যায়
হৃদয়ের তাজা আনন্দগুলো
রঙে ঝলমল
দিনগুলো আবীর গায়ে মেখে
প্রাণ খুলে হাসছে
হাসতে হাসতে ফেটে পড়ছে।
বুকের পাঁজরগুলো ফেটে যেতে যেতে
একটাই পথ চোখে ভেসে এল—
ঝলমল সংগ্রামী পথ।

স্বপন মালাকার

সূর্যসাধ

....

আমিও তো সূর্য হতে পারি—
নিত্য ক্ষয়ে যাওয়া এ দেহটা নিয়ে
আমিও তো ঝড়ের মুখোমুখি
হতে পারি।
যতই ক্লান্তি ভীড় করুক
আমার চেতনাকে ঘিরে—
যতই হতাশা আমার হৃদয়কে
কুঁরে কুঁরে থাক—
তবুও তো আমি
সমুদ্র হতে পারি।

আমার আকাশ থেকে
সমস্ত নক্ষত্র ঝরে গেলেও
আমার ক্ষণিক দীপ্তিটুকু বুকে নিয়ে
আমিও তো সূর্য হতে পারি॥

পবিত্র ভট্টাচার্য

ইয়েভতুশেংকোর উদ্দেশে

....

এক একটি ভোর বুঝি খুব অন্ধকার হয়—
কোনো আলোর রোশনাই হয়তো পারে না ক্ষণিকের জন্যেও
অন্ধকারের স্তরকে ভেদ করে আলোর ফোয়ারা বিধৃত করতে।
তেমনি একটি ভোর—উসুরির উপত্যকায়, চেনপাওয়ের মাটিতে—
দলত্যাগীরা হানা দেয় তুষারের অন্ধকারে।
সেই যে লোকটি লড়েছিল ইয়েনানে,
যার জামার পকেটে ছিল দুটি ফটো :
ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন আর জোসেফ স্তালিন—
ইয়েনানের তপস্যার কঠিন মুহূর্তগুলি সে সয়েছে—
ঐ প্রিয় ছবি দুটির পরশে
আজও তেমনি ছিল দুটি হাত বুকে
চেনপাওয়ের মাটিতে—
সে ভাবতেই পারেনি—তার হৃৎপিণ্ডের
সমস্ত রক্ত উজাড় হয়ে
পকেটে রাখা ফটো দুটিকে একেবারে অস্পষ্ট করে দেবে।

উসুরির জল লাল হলো ;
দলত্যাগীর গুলি লেনিন-স্তালিনের ছবি শতচ্ছিদ্র করে দিয়ে গেল।
কিন্তু ইয়েভতুশেংকো, তুমি নাকি শিল্পী ;
বড়াই করো তুমি নাকি বিদ্রোহী ?
কোথায় ছিল তোমার চেতনা ?
যখন, ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র গোলাপের পাপড়ি ঝরছিল
নিতান্ত অসময়ে, লাতিন আমেরিকার মানুষগুলি লড়ছিল
গুলিবিদ্ধ চে-কে স্মরণ করে

একবারও কি তোমার শিল্পীহৃদয় কেঁপেছিল ?–
আমেরিকার কালো মানুষগুলি যখন রক্তনদীতে স্নান করছিল
তখন তোমার লেখনী মস্কোর তুষারে অবরুদ্ধ হয়েছিল বুঝি ?
ইয়েভতুশেংকো, পতন যে কত তীব্র ভয়াবহ, তোমায় দেখে বোঝা যায়।
যখন মেকং-এর তীরে সোনা-গলানো নারীর যৌবনকে বিদ্ধ করছিল
ইংয়াংকির বেয়নেট—নাপামের তীব্র ঝলসানিতে কুঁকড়ে যাচ্ছিল
শিশিরের মতন সদ্যোজাত নরম শরীরগুলি—
তখন কি তোমার মার্কসের কথা মনে ছিল ?

কিন্তু আমরা জানি তখন তুমি জুতোর শুকতলা চাটছিলে,
লুটোপুটি খাচ্ছিলে, পোষা কুকুরের মতন
তোমার সেই প্রিয় ভদ্রলোকটির পায়ের তলায়
পৃথিবীর শিল্পী যাকে ঘোষণা করেছে গণহত্যাকারী বলে।
কিন্তু সোনার সোভিয়েত একেবারে শুকায়নি আমরা জানি
মায়াকভস্কি-গোর্কির দেশে তোমার মত ভণ্ডের পদচারণা
বেশি দিনের নয় ;
কারণ পাভেলের দল আবার জাগবে নিশ্চয়।
আর আমরা,
ঘৃণাই একমাত্র পবিত্র বস্তু এই মুহূর্তে।

দ্রোণাচার্য ঘোষ

বস্তুত এখন প্রয়োজন

....

সেই হিংস্র চতুরতা ভেঙে দিয়ে চরম নির্দেশে
এবার বন্দুক তোল ;   যে রকম বয়স আড়ালে
খুলে যায় লোকায়ত সময়ের সিঁড়ির কিনার
সাম্যবাদের রূপ খুঁজে পেতে দৃঢ়।

সাম্রাজ্যবাদের শেষ ধ্বংসস্তূপ ভেঙে ফেলে চুরমার করে
বন্দুকের নলে শক্তি—এই কথা সর্বশেষ জেনে
এবার ফেরাও অস্ত্র শত্রু চিনে প্রতি বুকে বুকে
শোষণবিহীন সেই সমাজের কাছাকাছি
ফিরে পেতে হৃদ্যতা, আরাম।

আমাদের জন্যে শুধু অবিরাম শোষণের গ্লানি :
এখন সময় নেই চপল ছায়ায় বসে গল্পের আসর
এখন সময় নেই পালন করি অসহায় চরিত্রের মদ ;
তীক্ষ্ণ বুলেটের মুখে বস্তুত এখন প্রয়োজন
শ্রেণীশত্রু নিধনের কঠিনকঠোর এক দৃঢ় সংগঠন।

রঞ্জিত গুপ্ত

জেলখানা

....

জেলের ভেতরে যারা মারা গেলি
তোদের কি বলবো
শুধু এইটুকু জেনে রাখ
তোদের যারা মারলো
তাদের মৃত্যু হবে তোদের চেয়েও মর্মান্তিক, আরো মর্মান্তিক
তোরা তো মারা গেলি চারদিক আটকানো জেলখানায়
চার দেয়ালের অন্ধকারে
আর ওরা, সমস্ত পৃথিবী
হাটখোলা পেয়েও
কোথাও পালিয়ে দুদণ্ড বসবার সময় পাবে না
যেখানেই যাবে সেখানেই
একটু বাদেই শুনবে ক্রমশ নিকটবর্তী বহুকণ্ঠের কোলাহল
কাছে আসছে ধরতে তাদের
কোন দিকে যাবে তারা ?
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব
পশ্চিম
সেখানেই যাবে সেখানেই
দেখবে বিশাল পৃথিবী কুঁচকিয়ে গুটিয়ে
মুহূর্তে
বিকট জেলখানা হয়ে গেছে ॥

ইন্দ্র চৌধুরী

ওরা জানতো না

....

ওরা জানতো না
পাথরের বুকেও আগুন আছে।

জানতো না
ঝরা পাতায়
বসন্ত
গোপন ইস্তাহার পাঠিয়ে দেয়—
ঝড় আসছে
সবুজের উদ্দাম ঝড়।

তাই
ঘা দিতেই
পাথরের বুক থেকে
ঠিকরে পড়লো লাল ফুলকি,
ঝরা পাতার বন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে
কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ফুলে
লক্‌লক্‌ করে উঠলো আগুনের শিখা।

ওরা
'দমকল দমকল' বলে চিৎকার করে উঠলো
কেননা
ওরা জানে
চোখের জলে বুকের আগুন নিভে যায়
শোক দুর্বল করে মানুষকে।

কিন্তু
সমস্ত বন হলুদ পাতায় ভরে গেলে
শোষিতের দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে
ঝড়ের মতো পাকিয়ে ওঠে ঈশান কোণ
সব কিছু ওলোট পালোট করে দেয়।

তখন

ঘৃণা ও ক্রোধ
বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে আমাদের চোখে
বুকের পাঁজরে
বজ্রের শঙ্খকে আমরা বাজিয়ে তুলি ফুৎকারে
ঝড়কে ছড়িয়ে দিই ঝরা পাতার বনে বনে
ফসল ফলাবার কঠিন শপথে
মাঠে নামি হাতিয়ার হাতে

কেননা

লড়াইকে আমরা লড়াই দিয়ে অভিনন্দন জানাই
শুধুমাত্র ধর্মঘট
বা
কালো ব্যাজ পরে নয়।

কল্যাণী সেনগুপ্ত

ভাস্বর হৃদয়ে

....

দরজাটা খোলা
তবু বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না
উঁকি মেরে দেখতো
ভিতরে আগুন জ্বলছে কিনা।

দরজাটা খোলা
ভিতরে আগুন জ্বলে
উঁকি মেরে দেখতো
সে আগুনের উত্তাপ মাপা যাবে কিনা।

দরজাটা খোলা
ভিতরে সূর্যের উত্তাপ
উঁকি মেরে দেখতো
সেই উত্তাপে যার দেহ পোড়ে
সে আমার দেহ কিনা।

মধুমিতা মজুমদার

ওরা আর কাঁদে না

....

ওরা এতদিন মাথা হেঁট করে
তোমাদের পায়ের তলায় ছিল।
জীবন মানে সংগ্রাম, এ কথাটা
ওদের বুঝতে দাও নি,
তাই ওদের নিয়ে যা খুশি
করেছিলে।

ওরা কিন্তু এবার জীবনের মানে
খুঁজে পেয়েছে। মুক্তির আস্বাদ
পেয়েছে হাতিয়ার তুলে ধরে।
তোমাদের পা দুটোকে পুড়িয়ে দেবে ;
ওদের চোখে আগুন
ওরা বুঝেছে কান্না নিয়ে বাঁচা
যায় না। তাই, ওরা আর কাঁদে না।

অভীক গঙ্গোপাধ্যায়

ভোলা যায় না

....

৫

অত্যাচারে বেঁকে-যাওয়া দেহে
যারা ঘৃণার দুরন্ত তীর জুড়ে
মাটি কাঁপিয়ে চলতো
তাদের ভোলা যায় না।

তাদের ভোলা যায় না
যাদের রক্তে উগ্রনদীর প্লাবন
আর হাতে
আকাশের চেয়ে উঁচু স্বপ্ন
শিশু দোলনার তালে তালে
পৃথিবীর এ মহল্লা থেকে
ও মহল্লায় ঘুরে বেড়াত॥

এখন আমি
বলিষ্ঠ তুলির টানে
একটা নতুন শিশুর মুখ আঁকবো;
আর
ঘুমন্তদের ডেকে বলব
শহীদের সেই উজ্জ্বল স্বপ্নের কথা—

যে স্বপ্ন দেখতে কোন দিন ঘুমতে হয় না॥

ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়

জেলের গরাদ ধরে

....

জেলের গরাদ ধরে তবুও দাঁড়িয়ে
নষ্টপ্রাণ সন্তানের জননী,
লুপ্ত-রূপ মাংসপিণ্ড, রক্তক্লেদ হাড়-মাংস-মজ্জার গভীর হতে
চিনে নেবে সন্তানের
প্রিয়তম মুখ।

চেনো তুমি, কে তোমার পেটের সন্তান?
সনাক্ত করেছ
কোনটা ছেলের লাশ?
কাকে তুমি গর্ভে ধরেছিলে?

কাকে ভিন্ন করে বেছে নেবে
সন্তানের মা?
একই রক্ত প্রবাহিত সকল শরীরে,
নিশ্বাসের বাতাস
একই; বারুদে বিশ্বাস
যাদের; তাদের সমানপ্রাণ
রক্তের সমুদ্রে শুয়ে
তারা আজও মাটির সন্তান

জেলের গরাদ সর্বশূন্য, হে জননী
ভিন্ন করে
কার মুখ খুঁজে নিতে চাও?

অমিত দাস

শীতের কোলকাতা : ১৯৭১

এ আরেক শীতের কোলকাতা—
আগে কোনদিন দেখিনি
কোনদিনও দেখিনি !

সময় রক্ত দিয়ে আমার চোখ ধুয়ে দিচ্ছে,
অত্যাচারীর গরাদের আড়াল থেকে
কয়েক হাজার তরতাজা বিপ্লবী চাউনি
আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—
এ আরেক শীতের কোলকাতা।

এখন অগুন্তি নির্ভীক মানুষ
পুলিশের গুলির মুখোমুখি
দৃপ্ত শপথে
রক্ত আর বারুদ দিয়ে মাতামাতি করছে,
দৃষ্টিতে আগুনে ইস্তেহার ছড়াতে ছড়াতে
ভারী কুয়াসা কাটাচ্ছে,
আমার ঘুম ভাঙাচ্ছে—
এ আরেক শীতের কোলকাতা।

এখন অলস লুকোচুরি চলবে না,
সব খিড়কির দরজা বন্ধ ;
কালো পিচের রাস্তায় ঝলসে উঠছে রক্ত বিদ্যুত;
সামনে একটাই পথ—
এ আরেক শীতের কোলকাতা।

এর আগে কোনদিন
কোন শীতের কোলকাতা
এভাবে বুকের রক্ত ঢেলে বলেনি—
"বসন্ত আসছে !"

আলোক বসু

তবু আলোকিত তোমার মুখ, কেননা

....

ওরা তোমাকে ভয় দেখালো অত্যাচারের
তবু তুমি নীরব
ওরা তোমাকে ভয় দেখলো হত্যার
তবু তুমি নীরব
ওরা তোমাকে ভয় দেখালো নারীত্বের
তবু তুমি নির্ভীক

লক আপের এক কোণে ধর্ষিত তোমার শরীর
তবু আলোকিত তোমার মুখ,

কেননা পৃথিবীকে তুমি ভালবেসেছ নিবিড় ভাবে
কেননা তুমি বিশ্বাস কর
ভালবাসার অপর নাম সংগ্রাম
কেননা তুমি ভালবেসেছ
তোমার সেই অন্তরঙ্গ সাথীদের
যাদের হাতে হাত রেখে
একদিন পৃথিবীর এ মহল্লা থেকে ও মহল্লা
ভালবাসার গান গেয়ে বেড়াতে
এবং বিশ্বাস কর
তাদের শোক, তাদের ক্রোধ তাদের ঘৃণায় সমস্ত উদ্যম।

ধ্বংসের দিব্যাস্ত্র হয়ে ছুটে যাবে
যারা তোমার ভালবাসার দরজায়
অক্ষৌহিনী সেনা সাজিয়ে বসে আছে তাদের দিকে।

